ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজির পূর্ণাঙ্গ জীবনী

বঙ্গবিজেতা বখতিয়ার

মুহাম্মাদ সাদ সাকী

বাতায়ন

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

নাম-পরিচয় ও প্রাথমিক জীবন

নাম ও নাম সম্পর্কিত মতভেদের সমাধান ১৯
জন্ম ও জন্মস্থান ২১
বংশপরিচয় ও জাতিসত্তা ২১
তুর্কি পরিচিতি ও তুর্কি-আফগান সম্পর্ক ২৩
দৈহিক গঠন ও স্বভাব-চরিত্র ২৫
বাল্যকাল ও পারিবারিক অবস্থা ২৬
সমকালীন সুলতান মুহাম্মাদ ঘুরি ২৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

কর্মজীবনে পদার্পণ ও ভাগবত-ভুইলির জায়গিরদার

কর্মজীবনের প্রারম্ভিকতা ৩৪
বাদাউনে কর্মজীবন ৩৬
বাদাউনের পরিচয় ৩৭
কশটমন্ডির শাসক বখতিয়ার ৩৮
হিন্দুস্তানে আগমনের কারণ ৩৯
অযোধ্যায় জায়গিরদার ৪২
ভাগবত-ভুইলির পরিচয় ৪৩
জায়গিরদাতা সম্পর্কিত মতভেদ ও সমাধান ৪৫
কুতুব উদ্দিন আইবেক কর্তৃক স্বীকৃতি ৪৫
কুতুব উদ্দিন আইবেক ৪৬

তৃতীয় অধ্যায়

বিহার অভিযান ও অধিকার

ওদন্তপুর বিহার আক্রমণ ৫৩
বিহারের পরিচয় ৫৪
ওদন্তপুর বিহার ৫৫
বিহার অভিযানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ৫৬
ওদন্তপুর অধিকার-পরবর্তী অবস্থা ৫৯
বিহার অভিযানে প্রতিপক্ষের প্রতিরোধ ৬২
বিহারে অধিকৃত স্থানসমূহ ৬৪
কুতুব উদ্দিন আইবেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও স্বীকৃতি অর্জন ৬৫

চতুর্থ অধ্যায়

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস : প্রচলিত মিথ ও ইতিহাসের বাস্তবতা

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ৬৯
নালন্দা ধ্বংসের ইতিহাস ৭০
নালন্দা যেভাবে ধ্বংস হয়েছিল ৭৪
নালন্দার অভিযোগ যেভাবে চাউড় হলো ৭৬

পঞ্চম অধ্যায়

বখতিয়ার পূর্বকালীন বঙ্গপরিচিতি
রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও মুসলিম আগমনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

তৎকালীন বঙ্গদেশ ৮১
তৎকালীন বাংলার ধর্মীয় ও সামাজিক চিত্র ৯০
সেনরাজাদের শাসন ৯৪
লক্ষ্মণ সেনের পরিচয় ৯৭
বাংলায় মুসলমানের আগমন ৯৯
ইসলাম প্রচারে সুফিদের ভূমিকা ১০২

ষষ্ঠ অধ্যায়

বঙ্গাভিযান ও অধিকরণ

তবকাতে নাসিরিতে নওদিহ্ শহর ১০৭
নওদিহ্ নামকরণের উৎস ১০৮
নদীয়া-নবদ্বীপ ও নওদা বিতর্ক ১০৯

নবদ্বীপ-নদীয়া ১১০
নওদিহ্-নওদা ১১৩
নওদিহ্-বিজয়নগর ১২০
পর্যালোচনামূলক সিদ্ধান্ত ১২১
বঙ্গাভিযান ও বিজয় ১২৩
বখতিয়ার খলজি কি বঙ্গবিজেতা? ১২৫
বাংলায় আগমনের প্রেক্ষাপট ১২৬
বাংলায় অভিযানের সময়কাল ১২৭
বখতিয়ার ও আঠারো জন যোদ্ধা ১২৮
ব্রাহ্মণদের ভবিষ্যদ্বাণী ও লক্ষ্মণ সেনের জন্মকাহিনি ১৩১
যুদ্ধ-লড়াই ও স্থানীয়দের সহযোগিতা ১৩৪
সকোনাত রাজ্যের পরিচয় ১৩৬
গৌড়-লক্ষ্মাণবতী বিজয় ও রাজধানী প্রতিষ্ঠা ১৩৭
লাখনৌরে অভিযান ১৩৮

সপ্তম অধ্যায়

বখতিয়ারের রাজধানী দেবকোট

রাজধানী স্থানান্তর ১৪৩
দেবকোট ১৪৪
বাণগড় ১৪৫
গঙ্গারামপুর ১৪৭
সমৃদ্ধ নগর দেবকোট ১৪৭
দেবকোটকে বেছে নেওয়ার কারণ ১৪৮

অষ্টম অধ্যায়

তিব্বত অভিযানের ইতিবৃত্ত

তিব্বত অভিযান ১৫১
যুদ্ধাভিযানের সূচনাস্থল ১৫৬
প্রস্তরসেতু, বাঁকমতি নদী ও বর্ধনকোট শহর ১৫৭
সম্ভাব্য যাত্রাপথ ১৬১
তিব্বত অভিযানের লক্ষ্য ও প্রস্তুতি ১৬৩
তিব্বতের যুদ্ধ ১৬৬
তিব্বত অভিযানের সময়কাল ১৬৭

কামরূপ রাজ্য ও তৎকালীন রাজা ১৬৮
কামরূপরাজের বিশ্বাসঘাতকতা ১৬৯
ধর্মান্তরিত গোত্রপতি আলি মেচ ১৭২

নবম অধ্যায়

অভিমানী বখতিয়ার : জীবনের শেষ দিনগুলো

বখতিয়ারের রহস্যজনক মৃত্যু ১৭৮
বখতিয়ার খলজির সমাধি ১৮০
বুড়াপিরের স্বপ্নাদেশ ১৮২

দশম অধ্যায়

একনজরে বখতিয়ার খলজি

বখতিয়ার খলজির রাজ্যসীমা ১৮৫
বখতিয়ার খলজির ইতিহাস ও তার কালক্রম ১৮৬
অভিযানের পথরেখা ১৮৭

একাদশ অধ্যায়

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজির মূল্যায়ন

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ১৮৯
আনুগত্যপরায়ণ বখতিয়ার ১৯০
ধর্ম ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা ১৯১
সমরকুশলতা ১৯২
রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ১৯৩
প্রশাসনিক বিন্যাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা ১৯৪

প্রথম অধ্যায়

নাম-পরিচয় ও প্রাথমিক জীবন

নাম ও নাম সম্পর্কিত মতভেদের সমাধান

খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী তখন শেষাংশে উপনীত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে জয়জয়কার করছে ইসলামি রাজত্ব, মুসলমানদের শাসন। দিকে দিকে উড়ছে ইসলামি শাসনের বিজয়কেতন। বিশাল ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলেই তখন আধিপত্য কায়েম করতে সক্ষম হয়েছেন মুসলিম শাসকগণ। ঠিক সেই সময় আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত গরমশির জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করে একটি ছেলে। দিগ্বিজয়ের অসম সাহস, ন্যায় প্রতিষ্ঠার তীব্র তৃষ্ণা ও স্বপ্ন পূরণের দৃঢ় মনোবল নিয়ে পৃথিবীর বুকে পা রাখে ছেলেটি। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তির নামের সাথে মিলিয়ে অভিভাবকগণ তারও নাম রেখেছেন মুহাম্মাদ। ইতিহাসের পাতায় তিনি স্থান পেয়েছেন ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজি নামে।

এই মহান বিজয়ীর পূর্ণ নাম কী, তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানান মতভেদ পাওয়া যায়। কেউ কেউ তাকে বখতিয়ারের ছেলে মুহাম্মাদ ইখতিয়ার উদ্দিন বলার চেষ্টা করেছেন। এজন্যই অনেক ইতিহাসবিদ তার নাম লেখেন—ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খলজি/খিলজি। কিন্তু মুহাম্মাদ বখতিয়ারকে গভীর থেকে জানতে হলে যে বইটির দ্বারস্থ না হয়ে সত্য জানা সম্ভব নয়, তা হলো 'তবকাতে নাসিরি'। ইতিহাসের এই আকর গ্রন্থটি লিখেছেন সুলতান মুইজ উদ্দিন বাহরাম শাহের শাসনামলে দিল্লিতে নিযুক্ত কাজিউল কুজাত (প্রধান বিচারপতি) আবু ওমর ওয়া মিনহাজ উদ্দিন উসমান ইবনু সিরাজ উদ্দিন রহিমাহুল্লাহ। সংক্ষেপে তাকে বলা হয় মিনহাজ উদ্দিন সিরাজ বা মিনহাজ-ই-সিরাজ। বখতিয়ার খলজির মৃত্যুর অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে যাওয়ার পর গ্রন্থটি তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন।

মিনহাজ উদ্দিন সিরাজ রহিমাহুল্লাহ তবকাতে নাসিরির মূল গ্রন্থটি ফার্সি ভাষায় রচনা করেছেন। এটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন মেজর রেভার্টি এবং বাংলায় আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া।

রেভার্টি তার অনুবাদের টীকায় দাবি করেছেন, মুহাম্মাদ বখতিয়ারের পূর্ণ নাম হবে 'ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার'। আরবিতে 'বিন/ইবন' অর্থ ছেলে। মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার অর্থ হলো বখতিয়ারের ছেলে মুহাম্মাদ।

রেভার্টির দাবির ওপর প্রশ্ন উত্থাপন হতে পারে, তাহলে তবকাতে নাসিরিতে 'বিন/ইবন' নেই কেন? তিনি এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে—তবকাতের পরবর্তী প্রতিলিপিগুলোতে (নুসখাগুলোতে) 'বিন' বাদ পড়ে গেছে। এটি অনিচ্ছাকৃত ভুল। তবে মুহাম্মাদ শব্দটি বখতিয়ারের সাথে ইজাফত (ফার্সি ও আরবি ভাষায় এক শব্দকে অন্য শব্দের সাথে সম্বন্ধিত করা) করার দরুন বুঝে নিতে হবে মুহাম্মাদই বখতিয়ারে ছেলে। এই ইজাফতটাই 'বিন'–এর সমার্থক। সুতরাং মুহাম্মাদে বখতিয়ার অর্থ হলো মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার।[১]

তবে আব্দুল হাই হাবিবি কর্তৃক সম্পাদিত এবং কাবুলের আঞ্জুমানে তারিখে আফগানিস্তান-এর প্রকাশনায় তবকাতে নাসিরির একটি সংস্করণ প্রকাশ করা হয়েছে। সেই সংস্করণেও ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজি লেখা রয়েছে।[২] বিন/ইবন শব্দটি সেখানেও নেই। এ ক্ষেত্রে 'ইখতিয়ার উদ্দিন'–কে তার উপনাম বলা যেতে পারে। আর মুহাম্মাদ বখতিয়ার তার মূল নাম।

এখন ইতিহাস-পাঠকের বিবেকের কাছে বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে যে, পাঠক একজন ইংরেজি অনুবাদকের দাবি করা তথ্যটি গ্রহণ করবেন নাকি ফার্সি ভাষাভাষী আঞ্জুমানে তারিখে আফগানিস্তান কর্তৃক প্রকাশিত দক্ষ ও প্রাজ্ঞ সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থের উপস্থাপনাকে মূল্যায়ন করবেন! অথচ মূল গ্রন্থটিও ফার্সিতেই লেখা হয়েছে।

তা ছাড়া আরবি কিংবা ফার্সি ভাষা সম্পর্কে যারা ন্যূনতম ধারণা রাখেন, তারা জানেন যে, সুনির্দিষ্ট কোনো নামের সাথে সুনির্দিষ্ট নামের (علم-এর সাথে علم-এর) ইজাফত সাধারণত করা হয় না। অতএব, মুহাম্মাদে বখতিয়ার (বখতিয়ারের মুহাম্মাদ/বখতিয়ারের ছেলে মুহাম্মাদ) বলাটা শুদ্ধ নয়। সুতরাং ভুলটা প্রতিলিপিকারের নয়; বরং বলা যেতে পারে, এটি মিস্টার রেভার্টিরই ভুল। বলাবাহুল্য, পরবর্তীতে যারা 'বিন বখতিয়ার' লিখেছেন তারা রেভার্টিকে অনুসরণ করেই লিখেছেন।

এত সব কথা ছাড়াও রেভার্টির দাবিকে প্রত্যাখ্যান করার আরও শক্তিশালী কারণ আমাদের হাতে রয়েছে। সুখময় মুখোপাধ্যায় তার ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন, "কিন্তু এ ব্যাপারে তার উপর আস্থা রাখা কঠিন, কারণ 'বিন' সম্বন্ধে তার একটা বাতিক ছিল। আলী মর্দানকে তিনি বলেছেন "আলী বিন মর্দান" এবং মুহম্মদ শিরানকে বলেছেন 'মুহম্মদ বিন শিরান'। শুধু তাই নয়, 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'তে মুহম্মদ মাহমূদ নামে ইখতিয়ারুদ্দীনের একজন কাকার নাম পাওয়া যায়; রেভার্টি এঁকে বলেছেন 'মুহম্মদ বিন মাহমূদ'। তার মতের হাস্যকরতা প্রমাণ করা কিছু কঠিন নয়। ইখতিয়ারুদ্দীনের পিতার নাম যদি বখতিয়ার হয় এবং পিতামহের নাম যদি মাহমূদ হয়—তা হলে তিনি এবং তাঁর কাকা উভয়েরই মূল নাম দাঁড়ায় শুধুমাত্র 'মুহম্মদ' ('ইখতিয়ারুদ্দীন' উপাধি); তা অসম্ভব।"

সুখময় আরেকটু সামনে বেড়ে রেভার্টিকে খণ্ডন করে লিখেছেন, "তা ছাড়া এঁর নাম সম্বন্ধে 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'র তুলনায়, সমসাময়িক গ্রন্থ 'তাজ-উল-মাসির'-এর সাক্ষ্য অনেক প্রামাণিক; 'তাজ-উল-মাসির'-এ এঁকে পরিষ্কারভাবে "ইখতিয়ারুদ্দীন মুহম্মদ

মুহাম্মাদ ঘুরি আমরণ বড় ভাইকে শ্রদ্ধা করেছেন এবং তার অনুগত থেকেছেন। তার কোনো সন্তান ছিল না। তিনি স্বীয় তুর্কি দাসদের সাথে সন্তানের মতো আচরণ করতেন। তারা সৈনিক ও প্রশাসক, উভয় দিক থেকেই প্রশিক্ষণ লাভ করেছিল এবং তাদের উৎকৃষ্ট মানের শিক্ষা দেওয়া হতো। তার শাসনামলে সেনাবাহিনী ও সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে অনেক দাস অধিষ্ঠিত হয়েছিল।

মুহাম্মাদ ঘুরির মৃত্যুর পর সাম্রাজ্য দাসদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি কুতুব উদ্দিন আইবেক ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির শাসক হন এবং দিল্লি সালতানাতের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তার মাধ্যমেই ভারতে মামলুক রাজবংশের সূচনা হয়। তাই আইবেককে বলা হয় দিল্লির প্রথম সুলতান। মুহাম্মাদ ঘুরি এবং কুতুবউদ্দিনের শাসনামলেই বখতিয়ার খলজি বাংলার শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন।[৪০]

দ্বিতীয় অধ্যায়

কর্মজীবনে পদার্পণ ও ভাগবত-ভুইলির জায়গিরদার

কর্মজীবনের প্রারম্ভিকতা

স্বভাবতই মুহাম্মাদ বখতিয়ারের প্রাথমিক জীবনের পর আসবে কর্মজীবনের কথা। পূর্বে আমরা জেনেছি, বখতিয়ার খলজির প্রাতিষ্ঠানিক কোনো শিক্ষাদীক্ষা ছিল না। ঔপন্যাসিক শফীউদ্দীন সরদার তাকে মক্তবের ছাত্র হিসেবে চিত্রিত করলেও এর ঐতিহাসিক ভিত্তি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। তবে এই বিখ্যাত ঔপন্যাসিক দাবি করেছেন, তিনি ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস লিখলেও ইতিহাসকে 'এক বিন্দুও ক্ষুণ্ন করেননি'।[১] সুতরাং তার স্বীকারোক্তিকে সত্য হিসেবে মেনে নিলে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, ঐতিহাসিক কোনো তথ্য তিনি পেয়েছেন বলেই তা সংযুক্ত করেছেন।

মক্তবের স্বল্পশিক্ষিত হোক কিংবা অশিক্ষিত, মুহাম্মাদ বখতিয়ার রাষ্ট্রের দাপ্তরিক কোনো চাকরিকে প্রাধান্য না দিয়ে তিনি সেনাজীবনকেই বেছে নিয়েছিলেন।

ইতোপূর্বে আমরা বলে এসেছি, বখতিয়ার খলজি বিভিন্ন দরবার ও দপ্তরে সেনাবাহিনীতে চাকরির জন্য ছোটাছুটি করেছেন। একের পর এক তিনি প্রত্যাখ্যাতও হয়েছেন। কিন্তু হতোদ্যম হননি। প্রবল আত্মবিশ্বাস ও সফলতার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষাকে সঙ্গী করে কিছুতেই হাল ছাড়েননি নিজের আকাশছোঁয়া স্বপ্ন পূরণের জন্য।

বখতিয়ার সর্বপ্রথম চাকরির জন্য আবেদন করেন নিজ এলাকা গজনির তৎকালীন সুলতান মুইজ উদ্দিন মুহাম্মাদ শিহাব উদ্দিন বিন সামের অধীনস্থ দিউয়ানে আরজে। ইতিহাসে যিনি প্রসিদ্ধি পেয়েছেন সুলতান মুহাম্মাদ ঘুরি নামে। তৎকালে সেনাবিভাগকে বলা হতো দিওয়ানে আরজ। মুহাম্মাদ বখতিয়ার কুৎসিত চেহারা, অস্বাভাবিক লম্বা হস্তদ্বয়, শারিরীক দিক থেকে খাটো ইত্যাদি কারণে প্রত্যাখাত হন। সেনাপ্রধানকে আকৃষ্ট করার মতো বাহ্যিকভাবে তার মধ্যে তেমন কিছুই ছিল না। ফলে প্রত্যাখ্যাত হয়ে তিনি দিল্লিতে গমন করেন একই উদ্দেশ্যে।

অধিকাংশ ইতিহাসবিদ মুহাম্মাদ বখতিয়ারের কর্মজীবনের ইতিহাস গজনির সেনাবিভাগের আবেদনের মাধ্যমেই শুরু করেছেন। অর্থাৎ তিনি গজনিতে বা স্বদেশে অন্য কোনো পেশায় যুক্ত ছিলেন বলে ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায় না। তবে রিয়াজুস সালাতিনের গ্রন্থকার গোলাম হোসাইন সালিম এবং সুখময় মুখোপাধ্যায় নতুন ও ভিন্ন তথ্য প্রদান করেছেন। গোলাম হোসাইন সালিম লিখেছেন, "মুহম্মদ বখতিয়ার, ঘোর ও

তৃতীয় অধ্যায়

বিহার অভিযান ও অধিকার

অদম্য সাহস ও বীরত্বের অধিকারী ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজির প্রকৃত সৈনিক, রণকৌশলী যোদ্ধা ও দূরদর্শী শাসক-জীবনের শুরুটা হয় বিহার আক্রমণ ও আধিকরণের মাধ্যমে। তারপরই তিনি বিজয়ের ধারা অব্যাহত রাখার অনুপ্রেরণা ও সাহস অর্জন করতে পেরেছিলেন।

মুহাম্মাদ বখতিয়ারের বিহার-আক্রমণ ও দখলের বিবরণীটি গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে এতে দুটো অংশ রয়েছে।

১. বিহারে শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছা ছাড়া কেবলই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিযান পরিচালনা ও গনিমতের সম্পদ অর্জন।

২. সেনাভিযান পরিচালনা এবং বিহারে শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠাকরণ।

পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি, প্রাথমিকভাবে বখতিয়ার খলজি হিন্দু রাজ্যগুলোতে খণ্ড খণ্ড আক্রমণ করেন এবং শুধুমাত্র গনিমতের সম্পদ নিয়ে ফিরে আসেন। তবে শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করার কোনো চেষ্টা তিনি করেননি। তখন পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলোর শাসনক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। মগধে (মুন্দের ও বিহারের প্রাচীন নাম) তখন পাল বংশীয় শাসন চলছিল। ধর্মীয় পরিচয়ে তারা ছিলেন বৌদ্ধ। নামেমাত্র শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত ছিল তাদের। বখতিয়ার তাদের দুর্বলতাকে শতভাগ সাফল্যের সাথে স্বীয় স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যবহার করেন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝটিকা আক্রমণ করে এতদঞ্চলীয় মানুষদের ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলেন। এভাবে এক বছরেরও অধিককাল তিনি ঝটিকা আক্রমণ অব্যাহত রাখেন। তবকাতে নাসিরিতে বলা হয়েছে, 'এক-দুবছর' পর্যন্ত এই ঝটিকা অভিযান অব্যাহত থাকে।[১] এ সময়ে তার আধিপত্য বিস্তারের কোনো বর্ণনা ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায় না। বরং অযোধ্যার শাসক হুসাম উদ্দিন আগলবাক কর্তৃক প্রাপ্ত জায়গির ভাগবত-ভুইলিতে অবস্থান করেই তিনি এই আক্রমণগুলো পরিচালনা করতেন। বিপুল সংখ্যক সেনা ও যথেষ্ট সম্পদ সঞ্চিত হওয়ার পর তিনি ওদন্তপুর বিহার আক্রমণের ইচ্ছা করেন। বিহারে মুহাম্মাদ বখতিয়ারের সামগ্রিক কর্মজীবন ছিল অন্তত চার বছর।[২] এ সময়ে তিনি সেখানে বিভিন্ন জনপদ, দুর্গ অধিকার ও রাষ্ট্র-শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

চতুর্থ অধ্যায়

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস : প্রচলিত মিথ ও ইতিহাসের বাস্তবতা

বিহারে আরও একটি মহাবিহার বা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল; যেখানে প্রাচীনকাল থেকেই জ্ঞানচর্চা হতো। এটি নালন্দা বৌদ্ধবিহার। এটি এমন এক বিশ্ববিদ্যালয়, যার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা হয় না, বরং ধ্বংসের ইতিহাসচর্চা হয় ব্যাপকভাবে। অদ্ভুত হলেও সত্য যে, এই বিহারটির প্রতিষ্ঠাতার অনুসন্ধান করেন না ঐতিহাসিকগণ। বরং গবেষণা করেন ধ্বংসকারীর পরিচয় সনাক্তকরণে!

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজির বিরুদ্ধে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করার অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগটি বহুল চর্চিত ও প্রচলিত। ২০১৪ সালে ভারতের রাজ্যসভায় কংগ্রেস-সদস্য করণ সিং ও সিপিএম-সদস্য সীতারাম ইয়েচুরির মধ্যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসের বিষয়ে বিতর্ক হয়। করণ সিং অত্যন্ত জোর গলায় এবং শক্ত ভাষায় দাবি করেন—বখতিয়ার খলজির হাতে বিহারটি ধ্বংস হয়েছে। আমরা এই অধ্যায়ে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসের প্রকৃত ইতিহাস পর্যালোচনা করার প্রয়াস চালাব।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ভারতের বিহার রাজ্যের পাটনা থেকে ৮৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে এবং আধুনিক রাজগিরের ১১ কিলোমিটার উত্তরে বড়গাঁও নামক গ্রামের কাছে পাওয়া যায়। ভৌগলিকভাবে প্রাচীন বাংলার সীমানার বাইরে হলেও এই অঞ্চলের সাথে তার যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তাই বাংলার ইতিহাসচর্চার সাথে সাথে বিশ্ববিদ্যালয়টির ইতিহাসও খুব চর্চিত হয়।

ধারণা করা হয় গুপ্ত সম্রাটগণই সর্বপ্রথম এই বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নির্দিষ্ট করে কোনো সম্রাটের কথা উচ্চারণ করতে চাইলে রাজা কুমারগুপ্তের নামটি সামনে আসে। সাধারণভাবে প্রচলিত ইতিহাসের বিবরণী এর প্রতিষ্ঠাকাল বুদ্ধের সময়কাল পর্যন্ত নিয়ে যায়। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন থেকে গুপ্ত যুগের আগের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না।[১] মুসা আল হাফিজ মনে করেন, নালন্দা মহাবিহার নির্মাণ করেছেন বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ। তিনি নির্মাণের সময়কাল উল্লেখ করেছেন ৪২৭ খ্রিস্টাব্দ।[২] শুভজ্যোতি ঘোষ বলছেন ৪১৩ খ্রিস্টাব্দের কথা।[৩] শেষোক্ত মতটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

এই মহাবিহারের নাম নালন্দা হওয়ার কারণ হিসেবে গবেষকগণ উল্লেখ করেছেন, গ্রামটির নাম ছিল নালন্দা। মহাবিহারটি নালন্দা গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এর নামকরণ করা হয়—নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বা মহাবিহার। 'নালন্দা' শব্দের অর্থ 'দানে অকৃপণ'। জ্ঞান বিলাবার ক্ষেত্রে সত্যিই অকৃপণ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়টি।[৪]

ইতালির বোলোনিয়াতে যখন ইউরোপের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তখন নালন্দার বয়স ছাড়িয়ে গিয়েছে ছয়শ বছর। পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় এই নালন্দা।[৫] পুরো কমপ্লেক্সটি ছিল লাল ইটের চওড়া ও উঁচু দেয়াল দ্বারা সুরক্ষিত। পনেরো বর্গকিলোমিটার জুড়ে ছিল এর বিস্তৃতি। তার মধ্যে কেবল দশ শতাংশ খনন করা হয়েছে, বাকি অংশ এখনও মাটির নিচেই রয়ে গেছে। যে সময়ে পৃথিবীতে পারিবারিক বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষার বাইরে অন্য কোনো পঠনপাঠন পদ্ধতি চালু হয়নি, সেই সময়ে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার এবং শিক্ষকের সংখ্যা দুহাজার! তৎকালে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ভবনটি ব্যবহৃত হতো গ্রন্থাগার হিসেবে। শত-সহস্র বইপুস্তক ছিল পাঠাগারটিতে। একটি গ্রন্থাগার-ভবন ছিল নয় তলা উঁচু। চিনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে জানা যায়, নালন্দার শিক্ষাদীক্ষা ছিল সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। থাকা, খাওয়া, চিকিৎসা, সব কিছুই ছিল বিনিময়হীন। মূল ব্যয় বহন করা হতো রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে। জনসাধারণও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সন্ন্যাসী ও ছাত্রদের জন্য খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র ইত্যাদি দান করত। এখানে মূলত স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা প্রদান করা হতো। দেশ-বিদেশ থেকে হাজার হাজার ছাত্র ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করত। ফলে ভর্তি প্রক্রিয়া ছিল অত্যন্ত প্রতিযোগিতাপূর্ণ।[৬]

পাল বংশীয় রাজাদের শাসনামলে (আট থেকে বারো শতক) এটি বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। এই সময়ে এর শিক্ষাদীক্ষার মান সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। কারণ, পাল রাজাদের অকুণ্ঠ ও উদারহস্ত পৃষ্ঠপোষকতা এবং দান-দক্ষিণা এমন ছিল, যা গুপ্তদের কৃতিত্বকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।[৭]

নালন্দা ধ্বংসের ইতিহাস

গৌরব ও ঐতিহ্যের ধারক এই বিশ্ববিদ্যালয়টি তবে ধ্বংস হলো কবে? কে কীভাবে ধ্বংস করেছে একে? অনেকেই মনে করেন, নালন্দা ধ্বংস করেছেন ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খলজি। এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে রয়েছে তুমুল বিতর্ক। একদল ইতিহাসচর্চাকারী বখতিয়ারকে নালন্দার বিনাশকারী হিসেবে প্রমাণ করতে উঠেপড়ে লেগেছেন। কিন্তু ইতিহাসের আকরগ্রন্থের তথ্যসূত্র উল্লেখ করতে তারা বরাবরই ব্যর্থ হয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক আকসাদুল আলম তবকাতে নাসিরির বরাত দিয়ে দাবি করেছেন, নালন্দা ধ্বংস করেছেন বখতিয়ার খলজি। এই দাবিতে তিনি যথেষ্ট শক্ত অবস্থানে রয়েছেন।[৮] অথচ মিনহাজ উদ্দিন সিরাজ রহিমাহুল্লাহ এ জাতীয় কোনো তথ্য তবকাতে নাসিরিতে উল্লেখ করেননি। তিনি দুর্গ সদৃশ বিহারে আক্রমণের ইতিহাস

উদ্ধৃত করেছেন। সে তো ওদন্তপুরী বিহার। নালন্দা কখনোই দুর্গ সদৃশ ছিল না। তা ছাড়া ওদন্তপুর থেকে নালন্দার দূরত্বটাও উল্লেখযোগ্য!

নিশ্চিত হয়ে কীভাবে বলছি বখতিয়ারের আক্রান্ত বিহারটি ছিল ওদন্তপুর? এই প্রশ্নের উত্তর তবকাতে নাসিরিতেই দিয়েছেন মিনহাজ উদ্দিন সিরাজ রহিমাহুল্লাহ। তিনি সুলতান মুহাম্মাদ ঘুরির যুদ্ধজয়ের যে তালিকা দিয়েছেন, তাতে উল্লেখ করেছেন 'অদওয়ান্ড বিহার'-এর নাম।[৯] ফার্সি ভাষার অদওয়ান্ড বাংলায় যে উদ্দণ্ডপুর হবে তাতে কারও সন্দেহ হবার কথা নয়। আর বখতিয়ার খলজি যে সুলতান ঘুরিরই অধীন ছিলেন তা তো বলাই বাহুল্য। সুতরাং তবকাতে নাসিরির বরাতে নালন্দাকে বর্ণনা করতে চাওয়াটা ভুলই নয় শুধু, ইতিহাস বিকৃতির মতো একটা ঘৃণ্য কর্মও বটে!

ইতিহাসের পাতা থেকে হাল-জামানার সংবাদের শীর্ষে উঠে এসেছে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম। এর কারণ, ২০০৬ সালে উদ্ধারকৃত ধ্বংসাবশেষটিতে নবোদ্যমে ২০১৫ সাল থেকে চালু হয়েছে শিক্ষাধারা। ভারতের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের উদ্যোগে চালু হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। তার পরই উপমহাদেশ জুড়ে শুরু হয় কাগজের পুরনো স্তূপ থেকে খুঁজে বের করা নালন্দার কলঙ্কিত মিথের প্রসার এবং তার বিপরীতে খণ্ডনমূলক সত্য ও সঠিক ইতিহাসের চর্চা! ইতিহাস ও মিথ সর্বকালেই পরস্পর দুই মেরুতে অবস্থান করে এসেছে। একে অপরের সাথে সমন্বয় করতে পারেনি কখনোই। তবে সত্যের বিপরীতে মিথ্যা কখনো প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। সর্বদা সত্য প্রকাশিত হয় মিথ্যাকে বিদূরিত করার জন্যই।[১০]

বহিরাগতদের দ্বারা নালন্দা বিহার আক্রান্ত হয়েছে কয়েকবার। হিন্দু ও ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বৌদ্ধধর্ম ও তাদের শিক্ষালয়। ষষ্ঠ শতকের মিহিরাকুলের নিকট বৌদ্ধরা ছিলেন অসহ্যকর। তিনি পাটলিপুত্র আক্রমণ করার সময়ই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হয়েছিল। এরপর আরও কয়েকবার আক্রান্ত হয় নালন্দা। ইতিহাসের পাতা উল্টালে তিনবার ধ্বংস হওয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রথমবার রাজা স্কন্দগুপ্তের (২৫৫-৪৬৭ খ্রিস্টাব্দ) শাসনামলে রাজা মিহিরাকুলের নেতৃত্বে মধ্য এশিয়ার যুদ্ধবাজ সম্প্রদায় হানদের দ্বারা। মিহিরাকুল এই হানদের প্রচণ্ডরকম বৌদ্ধ বিদ্বেষী হিসেবে তৈরি করেছিলেন। বৌদ্ধভিক্ষু, ছাত্র, ধর্মগুরু এবং অন্যান্য শিক্ষার্থীদেরও গণহারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় মিহিরাকুলের নির্দেশে। স্কন্দগুপ্ত এবং তার পরবর্তী বংশধরেরা একে পুনর্গঠন করেন। নতুন করে শিক্ষাধারা চালু হয়। দেড় শতাব্দী পর আবারও ধ্বংস হয় নালন্দা। এবার আক্রমণ করেন আধুনিক বাংলার তৎকালীন শাসক শশাঙ্ক। তিনি বাংলার অন্তর্গত গৌড়ের মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তখন গৌড়ের রাজধানী ছিল বাংলার বর্তমান মুর্শিদাবাদে; তৎকালীন কর্ণসুবর্ণে। তার প্রচণ্ড শত্রুতা ছিল রাজা হর্ষবর্ধনের সঙ্গে। হর্ষবর্ধন বৌদ্ধদের পৃষ্ঠপোষক ও বিহারগুলোর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তাই উভয়ের মধ্যে সবসময়ই বিরোধ ও বিদ্বেষ জীবন্ত সজীব থাকত। এই ধ্বংসযজ্ঞে শশাঙ্কের হিন্দুধর্মবিশ্বাস এবং হর্ষবর্ধনের সাথে শত্রুতা প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে। তাদের মধ্যে খুব বড় একটা যুদ্ধও হয়েছিল।

পঞ্চম অধ্যায়

বখতিয়ার পূর্বকালীন বঙ্গপরিচিতি

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও মুসলিম আগমনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজি বিহার অধিকার করার পর বঙ্গবিজয়ের দিকে মনোনিবেশ করেন। অল্পকজন সেনাকে সঙ্গী করে বঙ্গের দিকে তিনি অগ্রসর হন এবং বিজয়ের সৌভাগ্য অর্জন করেন। যুগ যুগ ধরে ইতিহাসের পাতায় 'বখতিয়ার খলজি' নামটি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকার অন্যতম কারণ এই বঙ্গবিজয়। বখতিয়ারের বিজিত বঙ্গ আধুনিককালের সম্পূর্ণ বঙ্গ নয়, বরং পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের বিস্তৃত অংশ তিনি অধিকার করতে সক্ষম হয়েছেন। পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের বেশ কিছু অংশ তার অধীন হয়নি। তৎকালে পুরো বঙ্গ একই নামে একীভূত ছিল না। বরং বিভিন্ন অঞ্চল ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। তাই বখতিয়ারের বঙ্গবিজয়কে বুঝতে হলে আমাদের তৎকালীন বঙ্গপরিচিতি এবং তার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট জানা জরুরি। এই বিষয়টি বিবেচনা করে আমরা অতিরিক্ত একটি অধ্যায় সংযুক্ত করব। এই অধ্যায়ে আলোচিত হবে বঙ্গপরিচিতি, তৎকালীন শাসকদের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, সেন শাসনের সংক্ষিপ্ত চিত্র, লক্ষ্মণ সেনের পরিচয় ও বাংলায় মুসলমানদের প্রতিষ্ঠার পটভূমি।

তৎকালীন বঙ্গদেশ

তবকাতে নাসিরির বর্ণনা অনুযায়ী বখতিয়ার খলজি বাংলার যে অঞ্চলটি অধিকার করেছিলেন তা ছিল লক্ষ্মণ সেনের শাসনাধীন। মিনহাজ উদ্দিন সিরাজ রহিমাহুল্লাহ মূলত বখতিয়ারের নওদীহ/নুদিয়া আক্রমণের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। প্রসঙ্গত তিনি 'বঙ্গরাজ্য' ও 'লখনৌতি রাজ্য' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এই রাজ্যের সীমানা, বিস্তৃতি কিংবা অন্যান্য আনুষঙ্গিক কোনো পরিচয় উল্লেখ করেননি। তবে পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকদের বর্ণনা ও গবেষণায় রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজত্ব সম্পর্কে বিস্তর তথ্য উঠে এসেছে। তাই বলা যায়, মিনহাজ উদ্দিন সিরাজ রহিমাহুল্লাহ কর্তৃক উল্লিখিত বঙ্গরাজ্য মানে আধুনিককালের পূর্ববঙ্গ। আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া লিখেছেন, "বঙ্গদেশের সীমানা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। বিভিন্ন সময়ে বঙ্গের সীমানা পরিবর্তিত হয়েছে। প্রাচীনকালে অঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম ও বঙ্গ নামে যে পাঁচটি রাজ্যের নাম পাওয়া যায় তন্মধ্যে বঙ্গ ছিল সর্ব পূর্বে অবস্থিত। পুণ্ড্রদেশ অর্থাৎ বর্তমান উত্তরবঙ্গের পূর্ব সীমান্ত থেকে বঙ্গদেশের পশ্চিম সীমান্ত আরম্ভ